তেল আর ঘি
বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫০ ।
১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।
১৯. রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পরবর্তী বর্ষে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তেল আর ঘি

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

তেল আর ঘি

তেল কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা তিল থেকে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে তিলের কথা আছে। ঐতিহাসিক প্লিনি উল্লেখ করেছেন যে তিলের চাষ ভারতবর্ষে হয়। আর সেই তিল থেকে আরবীয়েরা তেল তৈরি করে। এর থেকে মনে হয় তিল-তেলের উৎপত্তিস্থল হল ভারতবর্ষ। তারপর এখান থেকে অন্যদেশে তার প্রচলন হয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা কিন্তু বলেন, তিলগাছের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ নয়। এর জন্মস্থান হল আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, সেখানে বারো জাতের তিল দেখা যায়, ভারতবর্ষে মাত্র দুই জাতের। যাই হোক, তিল-তেলের ব্যবহার কম প্রাচীন নয়। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরো-ডোটাস বার বার উল্লেখ করেছেন যে ব্যাবিলনবাসীরা কেবলমাত্র তিল-তেলের ব্যবহার জানত। সে তো আজকের কথা নয়, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে তিল-তেল ব্যবহার হচ্ছে। বৌদ্ধযুগে প্রদীপে তিল-তেল জ্বালানো হত। এই বিশেষ তেলকে বলা হত অধিমুক্তক। ত্রিরত্নের পাদপীঠে চন্দন সোম ও চম্পক সুরভিত তিল-তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হত। এদেশের তিল-তেলের প্রচলন কালক্রমে হল পারস্যদেশ ও মধ্য-এশিয়ায়। ক্রমশ চলে গেল চীন ও রুষদেশে।

আর-একটি প্রাচীন বীজ-তেলের নাম করা যেতে পারে—রেড়ির তেল। মিশরদেশে রেড়ির তেল ব্যবহার করা হত বলে হেরোডোটাস পরিচয় পেয়েছিলেন। মিশরবাসীরা রেড়ির তেল অঙ্গে মাখত বলে প্রকাশ। গ্রীসদেশে প্রচুর পরিমাণে রেড়ির গাছ জন্মায়, মিশরদেশে এর বহুল পরিমাণে চাষ হয়। নদী বা দীঘির ধারে, পুষ্করিণীর পাড়ে রেড়ির গাছ খুব জন্মায়। মিশরদেশের প্রাচীন কবর উদ্ঘাটিত করে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রেড়ির বীজও পাওয়া গেছে। মানুষের জীবিতাবস্থায় রেড়ি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার হত বলে মৃতদেহের সঙ্গে কবরেও স্থান পেয়েছিল। কেননা মিশরবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে জীবিতাবস্থায় ব্যবহৃত

দ্রব্যাদির প্রয়োজন মৃত্যুর পরেও হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, রেড়ির আদিম বাসস্থান তিলের মতই আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে। সেখান থেকে রেড়ির প্রচলন হয় মিশরদেশে আর মিশর থেকে আমাদের দেশে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থেও এর উল্লেখ নেই; বেদে নেই, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সচরাচর উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালে রেড়ির উল্লেখ এরণ্ড ও গন্ধর্ব নামে সংস্কৃত পুস্তকে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকে রেড়ির প্রচলন হয় চীনদেশে আর মলয় সুন্দ যব ও শ্যাম প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই খাদ্যহিসাবে শস্যজাত বীজ-তেল বা পশুজাত চর্বির তেল মানুষ ব্যবহার করে আসছে। বীজ-তেলের ব্যবহার বোধকরি জান্তব তেলের চাইতে প্রাচীন। চীন ও ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন দেশ। সরিষার জন্মস্থান হল চীনদেশে। ভারতবর্ষে চাষ করার জন্য সরিষার বীজ আনা হয়েছিল অন্য দেশ থেকে। সেটা কোন্ দেশ তা ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন না। তবে নিশ্চয়ই কোনো গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে। চীনদেশে অনেকদিন থেকে সরিষার চাষ হচ্ছে। মঙ্গোলিয়ার তুর্কীজাতি ইরানিদের কাছ থেকে সরিষার চাষ শেখে। পারস্যদেশ থেকে সুরু করে এদেশের সব গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সরিষার চাষ আজও করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ই-সীন নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক দুই জাতির সরিষা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন। এখনও শ্বেত বা রাই সরিষা আর কৃষ্ণ সরিষা আমাদের দেশে চাষ করা হয় এবং পেষাই করে তেল বার করা হয়।

আজও ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৈলবীজ উৎপন্ন করে। সরিষা তিসি তিল নারিকেল — সবই এদেশে পেষাই করে তেল বের করা হয়। খোল গরুমহিষের খাদ্য ও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে কর্ষিত জমির শতকরা প্রায় আটভাগ প্রতি বছর বিবিধ তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। তুলার বীজ, রেড়ির বীজ, চিনাবাদাম, পপিবীজ ও মহুয়া সব সমেত ৯৬২০ লক্ষ মণ বীজ বছরে উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি যদিও বীজ উৎপন্ন অনেক বেশি পরিমাণে করা হচ্ছে, কিন্তু দেশের বাহিরে বেশি রপ্তানি

করা হচ্ছে না। এদেশেই তা ব্যবহার হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বছরে ২৭০ লক্ষ মণ তৈলবীজ বিদেশে পাঠান হয়। আমেরিকা হল সবচেয়ে বড় ক্রেতা, এর পরে ফ্রান্স জার্মানি ইতালি ও হল্যাণ্ড।

এই ত গেল সংক্ষেপে বীজতেলের পুরাতত্ব। এখন তেলের বৈজ্ঞানিক তত্বটা ধরা যাক। বাংলাদেশে সরিষার তেল ত ঘরে ঘরে ব্যবহার হয়। সরিষায় দুই প্রকার তেল বিদ্যমান আছে। একটির জন্যে এর ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়, তাকে উদ্বায়ী তেল বলে; আর অন্যটিকে বদ্ধ তেল বলে। বদ্ধ তেলের পরিমাণ উদ্বায়ী তেলের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি। সরিষার দানা থেকে নির্গত তেল বলতে বদ্ধ তেলটাই বোঝায়। শুধু সরিষা কেন, তিল রেড়ি চিনাবাদাম নারিকেল তিসি প্রভৃতি বীজতেলে বিভিন্ন জাতীয় বদ্ধ তেল থাকে। বদ্ধ তেল বিভিন্ন অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের যৌগিক পদার্থ। সরিষার তেলে এরিউসিক অ্যাসিড, রেড়ির তেলে রিসিনিক অ্যাসিড, নারিকেল তেলে পামিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি গ্লিসারিনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে। বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐসকল অ্যাসিডের অবস্থিতি প্রমাণ করা যায়।

রসায়নের মতে মাখন আর ঘি একই জাতীয় জিনিস। শুধু তাই নয়, নারিকেল সরিষা ইত্যাদি তেলের সগোত্র। মাখনেও গ্লিসারিনের সঙ্গে অ্যাসিড যুক্ত আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাখনে গ্লিসারিন যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত অ্যাসিডগুলি মিশ্রিত আছে—

বিউটিরিক অ্যাসিড শতকরা	০. ১ ভাগ
কেপ্রইক, কেপ্রাইলিক ও কেপ্রিক অ্যাসিড	২. ১ ভাগ
মিরিস্টিক, পামিটিক ও স্টিয়ারিক অ্যাসিড	৪৯. ৪ ভাগ
ওলেইক অ্যাসিড	৩৬. ১ ভাগ
গ্লিসারিন	১২. ৫ ভাগ

এ ছাড়া মাখনে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ জল থাকে। ঘি আর মাখনে একই রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান। কেবল ঘিয়েতে জল থাকে না আর

বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য হয়। গ্লিসারিনযুক্ত অ্যাসিডকে উক্ত অ্যাসিডের গ্লিসারাইড বলা হয়। যেমন নারিকেল তেলকে রসায়নের ভাষায় বলতে পারি গ্লিসারাইড অব্ পামিটিক অ্যাসিড অথবা গ্লিসারিন পামিটেট।

মাখন বা ঘিয়ের পরিবর্তে একজাতীয় কৃত্রিম মাখন আজকাল বাজারে খুব চলছে। এর নাম মার্জারিন। তুলার বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেলকে হাইড্রোজেন্‌গ্যাস মিশ্রিত করে উত্তপ্ত কাঁচনলের ভিতর রাখা নিকেলচুর্ণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করালে তেলটি হাইড্রোজেন্‌যুক্ত হয়ে মাখনের মত গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। কৃত্রিম মাখন হিসাবে ব্যবহারও হয়ে থাকে।

মার্জারিন কথাটি প্রচলন করেন সেভ্রয়েল (Chevreul) নামে একজন প্রাচীন ফরাসি বৈজ্ঞানিক। কথাটি গ্রীকভাষা থেকে গ্রহণ করা, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল মুক্তার মত ঝকঝকে। স্টিয়ারিন আর পামিটিন নামক স্নেহপদার্থের মিশ্রণের মুক্তার মত দ্যুতির বর্ণনা করতে সেভ্রয়েল 'মার্জারিন' পরিভাষা ব্যবহার করেন। সেভ্রয়েল সে যুগে তেল চর্বি সাবান ইত্যাদির বহু রাসায়নিক গবেষণা করে গেছেন। মার্জারিন আবিষ্কার হলে যখন মাখনের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারা যাবে বলে কথা হল তখন ইউরোপে এ নিয়ে অনেক বিরুদ্ধ আলোচনা হয়। বিলাতের বিখ্যাত 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় লেখা হয়, "মার্জারিন মাখনের মতই তৈলাক্ত আর ঘন বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ মাখনের মত স্বাদ গন্ধ কখনোই থাকতে পারে না। কেননা মার্জারিনে তো সুগন্ধযুক্ত বিউটিরিক কেপ্রইক আর কেপ্রিক অ্যাসিড নেই। ইংলণ্ডেও মার্জারিন তৈরি করা আরম্ভ হয়েছে ঘোড়ার চর্বি থেকে।...যাই হোক রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যখন মাখন ও মার্জারিনে সঠিক প্রভেদ ধরা যাচ্ছে না, তখন বাজার থেকে মাখন তাড়াতে আর ক'দিন লাগবে ?" উক্ত পত্রিকায় 'ইংলণ্ডেও' কথাটি বলার কারণ হল সেই সমসময়ে, ১৮৭৩ সালে, আমেরিকাতে মাখনের পরিবর্তে মার্জারিন ব্যবহার সুরু হয়েছে। এর অনেক দিন পরে, ১৮৮৯ সালে, ইংলণ্ডে হাউস অব্ কমন্স বাটারিন ওলিও-বাটারিন ও মার্জারিন নামের মধ্যে বাছাই করে কৃত্রিম মাখনের মার্জারিন নামটিই বজায় রাখে এবং সাধারণ্যে প্রচলিত করে।

ফ্রান্সে সেভ্রয়েলের ছাত্র মেজ-মুরি (Mege-Mouries) মার্জারিন-শিল্প প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

জনসাধারণ কিন্তু মেজ-মুরির নাম জানে না। এই প্রসঙ্গে আর-একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিকের নাম করতে পারি, এঁর নাম জোবের (Jaubert)। ইনি চিনাবাদমের চাষ প্রচলন করেন। উত্তর-আফ্রিকায় জলপাইয়ের তেলের প্রচলন করেন ফরাসি ল্য তাঁ (Le Temps) পত্রিকার লেখক বুর্দ (Bourde)। এঁর নামও অনেকেই জানে না। বলা বাহুল্য চিনাবাদামের চাষের সঙ্গে চিনাবাদাম-তেল ও তাকে হাইড্রোজেনায়িত করে মার্জারিন তৈরি করার শিল্প গড়ে উঠেছে। তেল হাইড্রোজেন-ঘটিত করার পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন দুইজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক, সাবাতিয়ে (Sabatier) ও সেণ্ডারেনস (Senderens)। এই রাসায়নিক প্রণালীটি রসায়নশাস্ত্রে ও রসায়নশিল্পে এত বেশি কাজে লাগে যে তাঁরা উত্তরকালে এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার পান। আমাদের দেশে নারিকেল-তেল থেকে উক্ত উপায়ে তথাকথিত 'ভেজিটেবল ঘি' করা হয়, যা আজকাল বাজারে দালদা বা ঐ জাতীয় হাইড্রোজেনায়িত বীজতেলের সমকক্ষ। দুধ বা মাখন জাতীয় গব্য পদার্থে স্নেহ ছাড়াও ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ আছে। কিন্তু এই রকম কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত স্নেহতে কোনো খাদ্যপ্রাণ একেবারেই নেই। উপরন্তু এসব বেশিদিন ব্যবহার করলে চক্ষু রোগাক্রান্ত হয় বলে প্রকাশ।

এখন কথা হচ্ছে সরিষা নারিকেল তিল বা চিনাবাদাম প্রভৃতি বীজ-তেলে মাখন বা অন্যান্য গাঢ় স্নেহপদার্থের মত খাদ্যগুণ আছে কি না? যে কোনো স্নেহ পদার্থই শরীরে মেদ সঞ্চার করতে সাহায্য করে। আর তা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষ কত পরিমাণ স্নেহ পরিপাক বা আত্মসাৎ করতে পারে তার উপর। ধীরে ধীরে অভ্যাস করলে দৈনিক বেশ খানিকটা পরিমাণ স্নেহপদার্থ আমরা পরিপাক করতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, একজন মারোয়াড়ি যতখানি ঘি একদিনে খেতে পারে একজন বাঙালি তা পারে না। অবশ্য এমন বাঙালিও আছেন যিনি সাধারণ একজন মারোয়াড়ির চাইতে অনেক বেশি ঘি খেয়ে দৈনিক হজম করতে পারেন। তবে বেশি ঘি বা তেল খাওয়ার বিপদ আছে। খেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভার থাকে। অম্লরোগ হতে পারে। পিত্তরোগ ও মেদবাহুল্য ঘটতে পারে। তেমনি কম খাওয়াতেও আবার স্বাস্থ্যহানি হয়। সবচেয়ে বেশি দেখা যায়

কোষ্ঠকাঠিন্য আর শারীরিক শীর্ণতা, আর তার উপর গব্য জাতীয় স্নেহের ভিটামিন না পাওয়াতে শরীরের দৌর্বল্য। স্নেহ হিসাবে কৃত্রিম ঘি বা মার্জারিন, মাখন বা ঘিয়ের মত অত সহজে পরিপাক হয় না। এমনকি সবটা পরিপাক করার শক্তিও পাকযন্ত্রের থাকে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাখন, শূকরের বা গরুর চর্বি, চিনা-বাদামের তেল, জলপাইয়ের তেল, তূলার বীজের তেল প্রভৃতি সম্পূর্ণ হজম হয় এবং শরীর মেদল করতে সাহায্য করে। চর্বি বা বীজ-তেলে ভিটামিন নেই বললেই চলে। গব্যজাত মাখন দুধ প্রভৃতি স্নেহপদার্থে ভিটামিন আছে। বেশ খানিকটা বেশি পরিমাণেই আছে। তাই মাখন আর দুধ আদর্শ খাদ্য ও পানীয় বলা চলে। আজকাল বাজারে যা টিনে করা বিদেশি ছাপমারা মাখন দেখতে পাওয়া যায়, তাতে শতকরা ৮৫ ভাগ মাখন আছে, আর ১২ ভাগ মার্জারিন আছে। উপরন্তু যা'তে নষ্ট না হ'য়ে যায় তাই লবণ, বেঞ্জোএট অব্ সোডা, ডাইঅ্যাসেটাইল ইত্যাদি পচননিবারক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে। বীজতেলে সামান্য পরিমাণে এ বি ও ই ভিটামিন আছে, কিন্তু শোধন করবার সময় ঐসব ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্যে অনেক সময়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন তেলে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

খাদ্যহিসাবে ব্যবহার ছাড়াও তেল ঔষধহিসাবে, কখনও বা ঔষধ প্রস্তুতীকরণে, কাঠ বা লোহা জাতীয় ধাতুর উপর রং করবার জন্য, রঞ্জন-দ্রব্য মিশ্রিত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এসবের দৃষ্টান্ত পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পাওয়া যাবে। বাতাস ও রৌদ্রের সংস্পর্শে কোনো তেল সহজে শুকিয়ে যায় না, আবার কোনো তেল তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এই গুণ হিসাবে তেলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যেমন, (১) যে তেল একেবারেই বাতাসে ও রৌদ্রে শুকায় না; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, বাদাম-তেল ও রেড়ির তেল; (২) যে তেল খানিক শুকোয়, সম্পূর্ণ শুকোয় না; যেমন, সরিষার তেল ও তিল-তেল; আর (৩) যে তেল সহজে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, যেমন, তিসি ও পোস্তর তেল।

তেল আর ঘি পরীক্ষার প্রণালী

তেল বা ঘিয়ের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে হলে রাসায়নিক পদ্ধতিতে কতকগুলি পরীক্ষা করতে হয়। এই অধ্যায়ে সেই প্রণালীগুলির কথা সংক্ষেপে বলা হবে, যা'তে পরবর্তী অধ্যায়ে সরিষার তেলে মাখনে ও ঘিয়ে ভেজাল নিরূপণ করার কথা সহজে গ্রাহ্য হয়। সাধারণত তেল নিষ্কাশনের পর তার আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব মানে হল, সম আয়তনের জলের তুলনায় জিনিসটি কত ভারী বা হাল্কা। তেল সম্বন্ধে কথাটি আর-একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। (১) একটি ছোট গলা-সরু পাত্রে উপচে পড়া গোছ করে জল ভর্তি করে সাবধানে ওজন করে নিলাম; (২) তারপর জল ফেলে দিয়ে পাত্রটির ভিতর বাহির শুকিয়ে নিয়ে আবার ওজন করলাম। প্রথম ওজনটি থেকে দ্বিতীয় ওজনটি বিয়োগ করলে কিসের ওজন পাই? অবশ্যই ফেলে-দেওয়া জলটুকুর ওজন; এবং এই জলটির আয়তন হ'ল ঐ পাত্রের ভিতরকার আয়তনের সমান; (৩) ঐ পাত্রটিকেই আবার একইভাবে তেলপূর্ণ করে ওজন করলাম। এই তৃতীয় ওজন থেকে দ্বিতীয় ওজনটি বিয়োগ করলে ঐ পাত্রের ভিতরকার আয়তন বা ঐ জলের সম আয়তন তেলের ওজন পাই। এখন ঐ তেলের ওজনকে জলের ওজন দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল তেলের আপেক্ষিক গুরুত্বের ফল দেখাবে। সব তেলই জলে ভাসে। তার বৈজ্ঞানিক অর্থ হ'ল জলের গুরুত্বের তুলনায় তেলের গুরুত্ব কম। সাদা কথায় সম আয়তন জলের তুলনায় তেল হালকা, তাই জলে ভাসে। দেখা গেছে যে তেল যত গরম হয় তত তার আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায়। পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন ২৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপই তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সবচেয়ে উপযোগী উত্তাপ।

তারপর হল তেলের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা। বিজ্ঞানের পরিভাষা-গুলি বেশ গালভরা এবং এক কথায় সরলার্থ করাও আয়াসসাধ্য। কাজেই আবার বোঝাতে চেষ্টা করা যাক। আলোর রেখা, ধরুন সূর্য্যরশ্মি, যখন কোনো কাঁচ বা জল জাতীয় স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে

চলে তখন রেখার চলার পথ বেঁকে যায়। অনেকেই হয়ত চৌবাচ্চার জলে টিনের চালের ছিদ্র দিয়ে এসে পড়া রৌদ্র-রেখার গতিভঙ্গ লক্ষ্য করে থাকবেন। আলোকরেখার বাতাস থেকে কাঁচের ভেতর প্রবেশ করবার সময় গতিভঙ্গ হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই গতিভঙ্গ হওয়াকে বলে আলোকের প্রতিসরণ। আলোকের রেখার কত ডিগ্রি গতিভঙ্গ হল তা মাপা যায়, এবং কাঁচ বা বিভিন্ন স্বচ্ছপদার্থ যার ভিতর দিয়ে আলোকের রেখা গমন করছে তার উপর এই গতিভঙ্গ কত ডিগ্রি হবে তা নির্ভর করে। যেমন, জলের ভিতর দিয়ে গেলে যে মাপ হবে, তেলের ভিতর দিয়ে গেলে তা হবে না। আবার সরিষার তেলের ভিতর দিয়ে গেলে যা হবে, তিলের তেলের ভিতর দিয়ে গেলে তা হবে না। এবং সরিষার তেলে যদি তিল-তেল মিশ্রিত থাকে তা হ'লে মাপের অঙ্ক বদলে যাবে। এইজন্যে তেলের ভিতর দিয়ে যাওয়া আলোকরেখার প্রতিসরাঙ্ক মেপে তেলটির বিশুদ্ধতা বলা সম্ভব হয়।

যেসব তেল চরকা বা অন্যজাতীয় যন্ত্রে দেওয়া হয় তাদের সান্দ্রতা নিরূপণ করা হয়। তেল যদি বেশি চটচটে হয় তাহলে অবশ্যই সূক্ষ্ম যন্ত্রে দেওয়া চলে না। যেমন ধরুন, তিসির তেল সূক্ষ্ম-যন্ত্রী ঘড়িতে ব্যবহার করা চলে না। তেলের গুরুত্বের উপর সান্দ্রতাগুণ নির্ভর করে। কোনো একটা বিশেষ দৈর্ঘ্যের নল থেকে তেল প্রবাহিত হতে যে সময় লাগে তা তেলের গুরুত্ব অনুপাতে কমবেশি হয়। তার থেকে তেলটি কি পরিমাণে সান্দ্র তা নিরূপণ করা যায়।

তেল, বিশেষ করে ঘি ও মাখন, পুরাতন হলে টক হয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে তেল বা ঘি হল গ্লিসারিনঘটিত অ্যাসিড বিশেষ। অনেক সময়ে নৈসর্গিক উপায়েও গ্লিসারিন থেকে অ্যাসিড বিযুক্ত হয়ে যায় এবং তাতে তেল বা ঘিয়ের অম্ল আস্বাদ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য অম্ল আস্বাদ-যুক্ত ঘি বা মাখন খাওয়া চলে না। খেলে স্বাস্থ্যহানি হয়। এইজন্য তেল বা ঘিয়ের মধ্যে যে নিযুক্ত অ্যাসিড আছে, তা পরিমাপ করার ব্যবস্থা আছে। এক গ্রাম (gram) তেলে বা ঘিয়ে বিযুক্ত অবস্থার থাকা অ্যাসিড কয় মিলিগ্রাম কস্টিক-পটাশ খায় তা নিরূপণ করা হয়। এই অঙ্ককে অ্যাসিড গুণ (acid value) বলে।

ভালো ঘি বা তেলে বিযুক্ত অবস্থায় অ্যাসিড না থাকতে পারে।

কিন্তু গ্লিসারিনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় অবশ্যই থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে বিভিন্ন জাতের তেলে গ্লিসারিনের সঙ্গে বিভিন্ন জাতের অ্যাসিড যুক্ত হয়ে থাকে। রাসায়নিক প্রণালীতে এই অ্যাসিড থেকে গ্লিসারিন বিযুক্ত করে নেওয়া যায়। তেলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে হলে কৃত্রিম উপায়ে অ্যাসিডকে বিযুক্ত করে নিয়ে অ্যাসিডটির পরিমাণ মাপা হয়। মাপা হয় অবশ্য একটু ঘুরিয়ে। ঠিক কতটা পরিমাণ অ্যাসিড পাওয়া গেল তা সোজাসুজি না মেপে, মাপা হয় সেই অ্যাসিডটি বিযুক্ত করতে কতটা পরিমাণ কস্টিক পটাশ লাগে। এক গ্রাম (one gram ; ১ সের= ১ হাজার গ্রাম) ওজনের তেলে অবস্থিত যুক্ত বা বদ্ধ তেলে কয় মিলিগ্রাম (১ হাজার মিলিগ্রাম=১ গ্রাম) কস্টিক পটাশ খায়। এই পরিমাপকে সাবানভবনী-গুণ (saponification value) বলে। তেলের বিশুদ্ধতা নিরূপণে এই প্রণালীটি অপরিহার্য বললে অত্যুক্তি হবে না। যে কোনো তেলের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে হলেই তেলটির সাবানভবনী-গুণ নিরূপণ করা হবেই। সেইজন্যে তেল পরীক্ষাগারে সব সময় সাবানভবনী-গুণ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

এর সঙ্গে আইডিন-শোষণ-গুণ নিরূপণ করা হয়। একশ' গ্রাম ওজনের তেল যে কয় গ্রাম আইডিন শোষণ করতে পারে, সেই সংখ্যাকে আইডিন-শোষণ-গুণ বলে। তেলে গ্লিসারিনের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি অ্যাসিড যুক্ত থাকে যে তারা অনায়াসে কোহলে দ্রবিত আইডিন শোষণ করে নিতে পারে। আইডিন যে শোষণ করে নিচ্ছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। কোহলে দ্রবিত আইডিনের রং ঘন বাদামী (brown) টিন্‌চার আইডিনের রং। কিন্তু ঐ বিশেষ অ্যাসিডগুলির অবস্থানের ফলে আইডিন দ্রবণের রং একেবারে সাদা হয়ে যায়। যখন আর আইডিন শোষিত হয় না, তখন আইডিনের বাদামী রং বজায় থেকে যায়। এই রঙের পরিবর্তন ছাড়াও আর-একটি সূক্ষ্ম পরীক্ষার দ্বারা আইডিন শোষিত হয়েছে কি না নির্ধারণ করা যায়। বার্লি বা যে কোনো স্টার্চ-দ্রবণের সংস্পর্শে আইডিন-দ্রবণ এলে নীল রং উৎপন্ন হয়। তেলে যতক্ষণ আইডিন শোষিত হয় ততক্ষণ আর তেল নমুনাতে মিশ্রিত স্টার্চ-দ্রবণে নীল রং উৎপন্ন হতে পারে না, অথচ যেই শোষণ বন্ধ হয়ে যায় তখনই নীল রং উৎপন্ন হয়। অনেকেই লক্ষ্য করে

থাকবেন সদ্য ধোবার কাছ থেকে আসা কাপড়ে অসতর্ক অবস্থায় টিন্‌চার আইডিন পড়ে গেলে ঘন কালচে নীল রঙের ছোপ কাপড়ে লেগে যায়। এর কারণ আর কিছু নয়, ধোবা কাপড়ে মাড় অর্থাৎ স্টার্চ লাগায়, সেই স্টার্চের সঙ্গে আইডিনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে নীল রং উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিকরা আইডিনের এই গুণটি আইডিন-শোষণ নিরূপণে ব্যবহার করেছেন।

তৈল-রাসায়নিকের পক্ষে আইডিন-শোষণ-গুণটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই অঙ্কটির উপর আংশিক পরিমাণে তেলটির বিশুদ্ধতা নির্ভর করে বলা যায়, উপরন্তু তেলটির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছি, একটি তেলের নমুনা বাতাসে ও রৌদ্রে শুকোতে কতখানি সময় লাগে তার উপর তেলের শ্রেণীবিভাগ করা চলে। তিসির তেল সহজে শুকিয়ে যায় আবার রেড়ির তেল একেবারে শুকোতে চায় না। যে তেল একেবারে শুকোতে চায় না, তাদের আইডিন-শোষণ-গুণ ১০০ ডিগ্রির নিচে হয়। যে তেল খানিক শুকোয় তাদের হল ১০০ থেকে ১৩০ ডিগ্রি। আর তিসির তেলের মত যেগুলি সহজে শুকিয়ে যায় তাদের হল ১৩০ ডিগ্রির উপর। সাধারণত হ্যানাস (Hanus) আবিষ্কৃত প্রণালী কিংবা উইজ (Wij) আবিষ্কৃত প্রণালীতে আইডিন-শোষণ-গুণ নিরূপণ করা হয়। এদেশে আমরা হ্যানাস-প্রণালীতে বেশির ভাগ নিরূপণ করে থাকি।

কতকগুলি অ্যাসিড আছে যা তেল বা স্নেহ থেকে বিযুক্ত করবার পর উত্তপ্ত বাষ্পের সঙ্গে চোলাই হয়ে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি মাখনে থাকা (অবশ্য গ্লিসারিনযুক্ত হয়ে) অ্যাসিড, কিংবা নারিকেল তেলের অ্যাসিড। সাধারণত বীজতেলে এই জাতীয় অ্যাসিড থাকে না। ঘি ও মাখনেই থাকে। মাখনস্থিত বিউটিরিক অ্যাসিড এই জাতীয় অ্যাসিড। মাখনের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করতে এই অ্যাসিডের পরিমাণ মাপা হয়। এই পরিমাপকে বলে রাইখার্ট-ওলনি-গুণ (Reichert-Wollney value)। পাঁচ গ্রাম (gram) ঘি ও মাখন থেকে পাওয়া অ্যাসিডকে উত্তপ্ত বাষ্পের সঙ্গে চোলাই করে আনার পর কয় কিউবিক সেণ্টিমিটার ডেসিনরম্যাল কস্টিক পটাশ দ্রবণ সেই অ্যাসিডকে লবণে পরিণত করে তা মাপা হয়। সেই কিউবিক-সেণ্টিমিটারের সংখ্যাকে রাইখার্ট-ওলনি-গুণ

বলে। এখানে ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া হল। প্রথম হল কিউবিক-সেন্টিমিটার। যে কোনো দৈর্ঘ্য মাপতে হলে এর প্রয়োজন। ফরাসিরা একটি দণ্ডের মাপকে ধরে নিয়েছিলেন এক মিটার (metre)। এক মিটার লম্বা দণ্ডটি ইংরেজি মানদণ্ডে প্রায় তিনফুট-চারইঞ্চির সমান। এখন এক মিটারকে যদি এক শ সমান ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে তার এক-এক ভাগকে এক সেন্টিমিটার (centimetre) বলে। একটি যদি ছোট চারকোণা টিন নিই, যার দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার, প্রস্থ এক সেন্টিমিটার এবং উচ্চতাও এক সেন্টিমিটার, তা হলে সেই ছোট পাত্রটিতে জল ধরবে কত? বৈজ্ঞানিকরা বলবেন এক কিউবিক সেন্টিমিটার, বা বাংলামতে এক ঘন সেন্টিমিটার। আধুনিক বিজ্ঞানে যত কিছু দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার মাপ, সবই ফরাসিমতে হয়। কেননা, তাতে এই সুবিধা হয় যে সংখ্যার দশমিক রীতিটা আমরা সহজে ব্যবহার করতে পারি। দৈর্ঘ্য মাপার সবচেয়ে ছোট মাপ হল মিলিমিটার, অর্থাৎ এক মিটারের একহাজার ভাগের এক ভাগ। তা হ'লে এক মিলিমিটার হল এক সেন্টিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ। তাতে সুবিধা হল এই যে আমরা চট করে বলতে পারি, এক মিলিমিটার = ০.১ সেন্টিমিটার = ০.০০১ মিটার। মানদণ্ডের এই দশমিকগত সুবিধাটা সব দেশের বিজ্ঞানমহলই মেনে নিয়েছেন। কেবল বৃটিশ কতক কতক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন নি। তাতে তাঁদের অবশ্যই অসুবিধা ঘটে থাকে, তবে গোঁড়ামির বশে নেন নি, আর কি! দ্বিতীয়ত হল ডেসিনরম্যাল (decinormal) কথাটি। 'ডেসি' (deci) কথাটির অর্থ হল দশ ভাগের এক ভাগ। নরম্যাল কথাটির অভিধানঘটিত অর্থ যাই হোক, নরম্যাল-দ্রবণ অর্থ কিন্তু ভিন্ন। কস্টিক পটাশের নরম্যাল দ্রবণ অর্থ হ'ল ছাপ্পান্ন গ্রাম কস্টিক পটাশকে জলে দ্রবিত করে দ্রবণের ঘনমান এক হাজার কিউবিক সেন্টিমিটার করা হল। 'ডেসি'র অর্থ পূর্বেই বলেছি, ডেসিনরম্যাল দ্রবণ হ'ল পাঁচ দশমিক ছয় গ্রাম (৫.৬ গ্রাম) অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ৫৬ গ্রাম কস্টিক পটাশের ১০ ভাগের এক ভাগ নিয়ে জলে দ্রবিত করে পূর্ববৎ দ্রবণের ঘনমান একহাজার কিউবিক সেন্টিমিটার করা হল। তৃতীয়ত হল এসিডকে লবণে পরিণত করা। যে কোনো এসিড যে কোনো ক্ষারের সঙ্গে মিশ্রিত করলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া

ঘটে। ফলে একটি তৃতীয় পদার্থের উদ্ভব হয়, যেটি অ্যাসিডও নয় ক্ষারও নয়। সেই পদার্থটিকে লবণ বলে। কেননা আস্বাদে পদার্থটি সামুদ্রিক লবণের মতই কটু। সত্য কথা বলতে কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কস্টিক সোডা নামক ক্ষারের সঙ্গে মিশ্রিত করলে আমরা সামুদ্রিক লবণ পেয়ে থাকি। আমাদের এই মাখন থেকে পাওয়া অ্যাসিডটিও কস্টিক পটাশ নামক ক্ষারের সঙ্গে মিশ্রিত করলে লবণ উৎপন্ন হয়; অবশ্য এ লবণ তরকারি বা পাতে খাওয়া চলে না।

অনেক সময়ে তেল, অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড (Acetic anhydride) নামে একটি তরল পদার্থের সঙ্গে দুই তিন ঘণ্টা যাবৎ উত্তপ্ত করলে তেলস্থিত কোনো কোনো অ্যাসিড নতুন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই নতুন যৌগিক পদার্থটিকে অ্যাসিটিলেটেড যৌগিক পদার্থ বলে। পরে কস্টিক পটাশ মিশ্রিত করলে উক্ত যৌগিক পদার্থকে অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Acetic acid) বিযুক্ত হ'য়ে আসে। কত মিলিগ্রাম কস্টিক পটাশ এক গ্রাম অ্যাসিটিলেটেড পদার্থ থেকে অ্যাসেটিক অ্যাসিড বিযুক্ত করতে পারে তা নিরূপণ করা হয়, এবং সংখ্যাটিকে অ্যাসেটাইল মূল্য (Acetyle value) বলা হয়। সাধারণ তেলের অ্যাসেটাইল মূল্য ২.৫ থেকে ২০ পর্যন্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু রেড়ির তেলের অ্যাসেটাইল মূল্য ১৪২ থেকে ১৫০ পর্যন্ত হয়। তাই সরিষার তেলে রেড়ির তেল ভেজাল হিসাবে মিশ্রিত থাকলে এই অ্যাসেটাইল মূল্য নিরূপণে ধরে ফেলা সহজ হয়।

তেল বা অন্যজাতীয় স্নেহপদার্থ ক্লোরোফরম বা ইথারে দ্রবিত করে ব্রোমিন মিশ্রিত করলে কতকগুলি কঠিন পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়। সাধারণত তিসির তেলে এই রাসায়নিক পরিবর্তনটি চোখে পড়ে। কোনো কোনো মাছের তেলও ব্রোমিনঘটিত কঠিন পদার্থটি তেল থেকে পৃথক হয়ে আসে। তিসির তেল বা মাছের তেল থেকে পাওয়া কঠিন পদার্থটি ইথারে দ্রবিত হয় না। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা তিসির বা মাছের তেলের উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তিসির তেল থেকে পাওয়া ব্রোমিনঘটিত কঠিন পদার্থটি তপ্ত বেঞ্জিনে দ্রবিত হয়, কিন্তু মাছের তেলের ব্রোমিনঘটিত পদার্থটি দ্রবিত হয় না। তাই তেলের নমুনাটিতে তিসির তেল আছে কি মাছের তেল, কি উভয় তেলই মিশ্রিত আছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

তেলের নমুনাটি কোনোদিন গরম করা হয়েছিল কি না তাও রাসায়নিক পরীক্ষা করে জানা যায়। কয়েক ফোঁটা এনিলিন, কারবন টেট্রাক্লোরাইডে দ্রবিত করে তাতে কয়েক ফোঁটা ব্রোমিন মিশ্রিত করা হল। এই মিশ্রণে একটুখানি তেল মিশ্রিত করলে ঘন বাদামী (brown) রং উৎপন্ন হয়। কোনোদিন গরম করা না হলে ঘন বাদামী (brown) রং উৎপন্ন হয় না।

অনেক সময়ে ভেজাল হিসাবে ব্যাপারীরা খনিজ তেল বীজতেলে মিশিয়ে দিয়ে থাকে। সাবানভবনী-গুণের তারতম্য অনুসারে অনেক সময়ে খনিজ তেল মিশ্রিত আছে কি না তা ধরা পড়ে উপরন্তু কত ডিগ্রী উত্তপ্ত করলে তেলটিতে আগুন ধরে যায়, তা নিরূপণ করলেও খনিজ তেল আছে কি না জানা যায়। বীজ তেলে আগুন ধরাতে গেলে বেশ খানিকটা উত্তপ্ত করতে হয়। অথচ খনিজ তেলে সহজেই আগুন ধরে। তিসির তেলে আগুন ধরাতে গেলে অন্তত ২৪০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করতে হয়।

কোনো একটি তেলের নমুনাতে তুলার বীজের তেল আছে কি না তা সহজে পরীক্ষা করা যায়। একটি পাত্রে ঐ তেলের খানিকটা নিয়ে এমাইল কোহল আর কারবন ডাইসালফাইড মিশ্রিত করে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ উত্তপ্ত করলে, তুলার বীজের তেল থাকলে দ্রব্যটি রক্তাভ হয়ে যায়।

তিল-তেলের পরীক্ষা করতে হলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কোহলে দ্রবিত ফারফিউরাল, তেলের নমুনাটির সঙ্গে মিশ্রিত করতে হয়। দশ মিনিট পরে সামান্য পরিমাণ জল মিশ্রিত করে নাড়লে, দ্রবণটিতে তিল-তেল থাকলে লাল রং দেখা দেয়।

সরিষার তেল ও ঘিয়ের ভেজাল

সরিষায় দুই প্রকার তেল বিদ্যমান আছে। একটির জন্যে তেলে ঝাঁঝাল গন্ধ পাওয়া যায়। এটি হল সরিষাস্থিত উদ্বায়ী তেল। আর অন্যটি হল বদ্ধ তেল। এর পরিমাণ উদ্বায়ী তেলের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি। সরিষার তেল বলতে এই বদ্ধ তেলই বোঝায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে সরিষার তেল মাখার গুণ আছে। এতে শরীর মেদল হয়। খাদ্য হিসাবে সরিষার তেল অপেক্ষা তিল ও চিনাবাদামের তেল অনেক ভালো। সরিষার তেলে ভেজালরূপে সাধারণত শোরগোঁজা তিল চিনাবাদাম তিসি ও কুসুম বীজের তেল, কেরোসিন বা মেটে-তেল জাতীয় খনিজ তেল ব্যবহার করা হয়। কাঠের ঘানিতে বা কলে তেল নিষ্কাশনের সুবিধার জন্যে কিছু শোরগোঁজার দানা ব্যবহার করার দরকার হয়, তাই সরিষার তেলে শতকরা ২॥০ ভাগ শোরগোঁজার তেল থাকা বাংলা-প্রদেশের খাদ্য-আইন-সম্মত বলে ধরা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ পাবনা যশোর নোয়াখালি বগুড়া ঢাকা, ও পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় খুব তিলের চাষ হয়। ওখানকার তৈরি সরিষার তেলে তাই তিলের তেল ভেজাল চলে। তিলের তেল কিন্তু খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর। আর সরিষার তেলের চেয়ে খাদ্যগুণ বেশি। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে ও ব্রহ্মদেশে তিলের তেল রাঁধবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

মাদ্রাজ আর বোম্বাই প্রদেশে চিনাবাদামের চাষ হয়। মাদ্রাজে চিনাবাদামের তেলের কল আছে। আজকাল কলকাতা সহরেও চিনাবাদাম তেল তৈরি হচ্ছে। সরিষার তেলের চেয়ে চিনাবাদাম তেল সস্তা বলে চিনাবাদামের তেল সরিষার তেলে মেশানো হয়। তৈল ব্যবসায়ীরা অর্থের দিক দিয়ে তাতে লাভবান হয়। তবে উক্ত তেলের জন্যে সরিষার তেল ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যহানির কোনো আশঙ্কা নেই। ওষুধ আর পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে চিনাবাদাম-তেল বিভিন্ন দেশে আজও ব্যবহার হয়। আমরাও চিনাবাদাম তরকারিতে ব্যবহার করি। চিনাবাদাম তো সুখাদ্য। যদি চিনাবাদাম ও তিল তেলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা নেই, তবে

উক্ত তেল মেশানো সরিষার তেলকে খাদ্য-আইনে দণ্ডিত করা হয় কেন? আইন বলছে, খাঁটি সরিষার তেল বেচতে হবে। সরিষার তেলে অন্য তেলের ভেজাল স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে না হোক, অর্থের দিক দিয়ে ত ক্ষতিকর। জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি না করলেও ব্যাপারীরা ঠকায় ত! এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। জলমেশানো দুধ বেচার জন্যে এক গয়লার বিরুদ্ধে মামলা হয়। বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মচারীকে হাকিম প্রশ্ন করেন, "যদি খাঁটি দুধে, খাঁটি (অর্থাৎ পানোপযোগী) জলমেশানো থাকে, তবে সে দুধ বেচা কি দণ্ডনীয়?" কর্মচারী উত্তরে বলেন, "তাতে স্বাস্থ্যহানি হবে না ঠিকই, তবে যতখানি দুধ একজন পান করতে চায় তার চেয়ে কম ত পান করবে, ফলে তখন-তখনই না হোক কিছুকাল পরে তার শরীরের পুষ্টির অভাব লক্ষ্য হতে পারে। আর তা ছাড়া ক্রেতাকে যে দুধের দামে খানিকটা জলও কিনতে হচ্ছে।" তাই জলমেশানো দুধ খাদ্য-আইনে দণ্ডনীয়।

পূর্ববঙ্গে যশোর নোয়াখালী বাখরগঞ্জে, এদিকে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে তিসির চাষ হয়। বিহার দ্বারবঙ্গ গয়া সরণ চম্পারণ মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানেও তিসির চাষ হয়। কাঠ বা লোহায় লাগাবার রং গুলতে তিসির তেল ব্যবহার করে। তিসির তেল খাওয়া উচিত নয়। খেলে পেটের গোলমাল হয়। তিসির তেল মেশালে সরিষার তেলের ঝাঁঝ অনেক কমে যায় আর কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ পাওয়া যায়। তিসির তেলকে নিকেল চূর্ণের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনঘটিত করলে মার্জারিনের মত একটা কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। গত ১৯৪৪-৪৫ সালে শতকরা ৮০ ভাগ মার্জারিন অথবা মাখনের সঙ্গে শতকরা ২০ ভাগ হাইড্রোজেনঘটিত তিসির তেল মিশ্রিত করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সুইট্জারল্যাণ্ডে সেই সময় প্রায় ১৫০ লক্ষ মণ তিসি-বীজ রপ্তানি করা হয়, এবং সেখানে তেল পেষাই করে, পরে হাইড্রোজেনায়িত ক'রে মার্জারিনের সঙ্গে মিশ্রিত করে বাজারে ছড়ানো হয়। বলা বাহুল্য হাইড্রোজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটলে তিসির তেলের গুণ পরিবর্তিত হয়ে যায়, আর খাদ্য হিসাবে তেমন স্বাস্থ্যহানিকর থাকে না।

কুসুমবীজের তেল অবশ্য ভেজালরূপে বেশি ব্যবহার করা হয় না।

কুসুমবীজে হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড (Hydrocyanic acid) বলে প্রাণহানিকর বিষাক্ত পদার্থ থাকার সম্ভাবনা থাকায় কুসুমবীজের তেলের ভেজাল সত্যই বিপজ্জনক। অল্প পরিমাণে থাকলে, প্রাণহানি না হলেও, কঠিন রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তেলও মিশিয়ে থাকে। তেলের কলে খনিজ তেল ভেজালরূপে ব্যবহার করা হয়েছে বলে শোনা যায় নি। দূর গ্রামের ছোটখাটো দোকানদারেরা খনিজ তেল মিশিয়ে সাধারণ তেল বেচেছিল বলে অনেক দিন আগে ধরা পড়েছিল। কেরোসিন বা মেটে-তেল খাদ্য-তেলে থাকা যে বাঞ্ছনীয় নয়, সে কথা বলা বাহুল্য।

মার্জারিন মাখনের চাইতে সস্তা। সস্তা বলে চর্বিজাত মার্জারিন প্রায়ই মাখন বলে বেশি মূল্যে বেচা হয়। স্বাদে ও গন্ধে মার্জারিনকে মাখন বলে ভ্রম হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মার্জারিনও বাজারে পাওয়া মুশকিল। অনেক সময়ে মার্জারিনে স্টার্চ মেশায়; আবার মোম মিশিয়ে দেয়। রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়া মার্জারিন কি মাখন বোঝা শক্ত। মাখনে অনেক ক্ষেত্রে জল মিশিয়ে দেওয়া হয়, আর তার সঙ্গে যদি ম্যাগনেসিয়ম সলফেট বা এপসম সল্ট (Epsom salt) বা ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড জাতীয় রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বেশি পরিমাণ জল আছে বলে বোঝা শক্ত হয়। অনেক সময়ে মাখনের ভেজাল হিসাবে ছানাও ব্যবহার করে। ঘিয়েতে মার্জারিন বা জান্তব চর্বি জ্বালিয়ে ভেজাল দেওয়া চলে। তারপর তুলার বীজের তেল, তিলের তেলও থাকে। অবশ্য মাখনে মিশ্রিত তিলের তেল সহজে ধরা পড়ে বলে ব্যাপারীরা তিলের তেল বড়-একটা মেশায় না। শোনা যায় সাপের চর্বি, গরু বা শূকরের চর্বি জ্বালিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে ঘিয়ে খুব বেশি ভেজাল চলে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জান্তব চর্বি সহজে ধরা পড়লেও, সাপের কি শূকরের তা ধরা পড়ে না। ঘিয়ে নারিকেল তেলও ভেজাল চলে।

সরিষার তেল, মাখন ও ঘিয়ের এইসকল বিভিন্ন জাতীয় ভেজাল পরীক্ষা করবার রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সরিষার তেলের, গলান মাখনের বা ঘিয়ের ভিতর দিয়ে আলোকরেখার প্রতিসরণ মেপে

দেখা হয়েছে যে ৪০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে সরিষার তেলের প্রতিসরণ পরিমাপ ৫৮·৬ ডিগ্রি থেকে ৬১·১ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়। আর খাঁটি মাখন আর ঘিয়ের প্রতিসরণ পরিমাপ ৪০° ডিগ্রি থেকে ৪২·৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হয়। তারপর বিশুদ্ধ জলের তুলনায় খাঁটি সরিষার তেল ও মাখনের গুরুত্ব পরীক্ষা করা হয়। সরিষার তেলের ভেজাল পরীক্ষায় সান্দ্রতা নিরূপণ অন্যতম। বিশুদ্ধ তেলের সান্দ্রতা প্রায় ৭১·৬।

জল ও তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব, ১০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড

জল	১.০০০০
সরিষার তেল	০.৯১৫২
মাখন বা ঘি	০.৮৬৫৩ - ০.৮৬৬৮
মার্জারিন	০.৮৫৬০ - ০.৮৬০০
নারিকেল তেল	০.৮৬৮০ - ০.৮৭২০

এর পরে কি তেলের ভেজাল আছে তা নির্ধারণ করতে হয়। এর জন্যে তিল তিসি চিনাবাদাম প্রভৃতি তেল আছে কি না দেখা হয়। মাখন বা ঘিয়েতে নারিকেল তেল আছে কি না পরীক্ষা করা হয়। তেলের নমুনাগুলির সাবানভবনী-গুণ ও আইডিন-শোষণ গুণ নির্ধারণ করা হয়। এই দুটি নির্ধারিত সংখ্যা থেকেই সরিষার তেলের ভেজাল সুপ্রমাণিত করা যায়। ঘি ও মাখনের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্যে ও সাবানভবনী-গুণ ও তৎসহ রাইখার্ট-ওলনি-গুণ (Reichert-Wollney value) নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত দেখা যায় যে ১০০ ভাগ মাখনে ১০ ভাগ স্নেহ থাকলে রাইখার্ট-ওলনি সংখ্যা ৪ হয়। বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের রাইখার্ট-ওলনি সংখ্যা ২৪; অর্থাৎ বিশুদ্ধ গব্যঘৃতে কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ স্নেহ থাকবে। ঘিয়েতে জল থাকে না, মাখনে জলের ভেজাল চলে। তাই মাখনে জলের ভেজাল নিরূপণ করা হয়।

বিভিন্ন ভেজালের দরুণ সরিষার তেলের বিবিধ পরীক্ষার পরিমাপ কি রকম তফাৎ হয় তার তালিকা দেওয়া গেল। এর সঙ্গে বিশুদ্ধ সরিষার তেলের বিবিধ পরিমাপের তুলনা করে ভেজালঘটিত তেল ধরা যায়।

সরিষার তেলের পরিমাপ মূল্য

ভেজালের নাম	ভেজালের শতকরা পরিমাণ	প্রতিসরণ পরিমাপ	সান্দ্রতার পরিমাপ	সাবানভবনী গুণ	আইডিন শোষণ গুণ
শোরগোঁজা তেল	৫	৫৯.৬	৬০.০	১৭৩.৯	১০০.৩
শোরগোঁজা তেল	১০	৫৯.৮	৫৮.৮	১৭৫.৬	১০২.১
চিনাবাদাম তেল	১০	৫৮.৯	৫৭.৫	১৭৫.৬	৯৬.৯
তিল তেল	১০	৫৯.০	৫৯.৮	১৭৬.০	৯৮.৬
তিসির তেল	১০	৫১.৯	৫৬.৬	১৭৬.৭	১০৫.৩
বিশুদ্ধ সরিষার তেল (খাদ্য-আইন সম্মত)	০	৫৮.৬-৬১.১	৬৬.১-৭৩.৬	১৬৯-১৭৫	৯৬-১০৪

প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে ঘি আর মাখন একই রাসায়নিক পদার্থ। কেবল মাখনে জল থাকে, ঘিয়েতে থাকে না। বিশুদ্ধ মাখনে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ জল থাকে। এ ছাড়া বিশুদ্ধ মাখন ও ঘিয়ের প্রতিসরণ, সাবানভবনী-গুণ আর রাইখার্ট-ওলনি-গুণের পরিমাপ একই। নিম্নে খাদ্য-আইনসম্মত পরিমাপ মূল্য দেওয়া গেল।

ঘিয়ের পরিমাপ মূল্য

	প্রতিসরণ পরিমাপ	সাবান-ভবনী-গুণ	রাইখার্ট-ওলনি-গুণ
গাওয়া ঘি	৪০ - ৪২.৫	২২০	২৪
ভয়সা ঘি	৪০ - ৪২.৫	২২২	৩০
গাওয়া ও ভয়সা মেশানো ঘি	৪০ - ৪২.৫	২২২	২৮
মাখন	৪০ - ৪২.৫	২২০	২৪

সরিষার তেল রসায়নাগারে পাঠালে পরীক্ষক নিম্নলিখিত ধারাবাহিক পদ্ধতিতে তেলের ভেজাল পরীক্ষা করেন।

(১) কুসুমবীজের তেলে থাকা বিষাক্ত হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিডের পরীক্ষা। উক্ত অ্যাসিড পাওয়া গেলে আর অন্য কোনো পরীক্ষার দরকার হয় না। তেল অখাদ্য বলে বর্জন করা হয় আর বিক্রেতাকে খাদ্য-আইনে দণ্ডিত করা হয়।

(২) খনিজ তেলের পরীক্ষা

(৩) প্রতিসরণ পরিমাপ দেখা। (ক) পরিমাপ সংখ্যা ৬১-র ঊর্ধ্বে হলে নমুনাটিতে তিসির তেল আছে কি না পরীক্ষা করা হয়। (খ) পরিমাপ সংখ্যা ৫৮-র কম হলে চিনাবাদাম-তেল আছে কি না দেখা হয়।

(৪) সান্দ্রতা নিরূপণ। সান্দ্রতা সংখ্যা ৬৬-৬৭ হলেও নমুনাটি অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বলে ধরা যেতে পারে।

(৫) তেলটির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হলে সাবানভবনী ও আইডিন-শোষণ-গুণ নিরূপণ করা দরকার। এই সংখ্যাদ্বয় অতি সাবধানে, যত্নের সহিত নির্ধারণ করা হয়। এই দুইটি সংখ্যাদ্বারাই তেলের বিশুদ্ধতা সুনিশ্চিত ও সঠিক ভাবে নিরূপিত হ'য়ে থাকে।

কলিকাতায় বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগে পরীক্ষিত সরিষার তেল, ঘি ও মাখনের নমুনার শতকরা ভেজাল-সংখ্যা

	সাল	সরিষার তেল	ঘি	মাখন
(১) জেলাবোর্ড প্রেরিত				
	১৯৩৬	৪১.৪	৪৬.৪	
	১৯৩৭	২৫.০	৫২.৩	
	১৯৩৮	৩৫.৭	৫৯.৪	
	১৯৩৯	৩৯.৩	৫৭.৯	১০০.[illegible]
(২) মিউনিসি-প্যালিটি প্রেরিত	১৯৩৬	৩১.৩	৪২.৩	
	১৯৩৭	১৫.৬	৪৫.৯	
	১৯৩৮	২৫.৪	৪২.৯	
	১৯৩৯	৩৪.৪	৪১.৪	৭৬.৪

ঢাকায় বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগে পরীক্ষিত সরিষার তেলের
শতকরা ভেজাল-সংখ্যা

মিউনিসি-প্যালিটি প্রেরিত	১৯৩৪	৪৮.০
	১৯৩৫	৪৪.০
	১৯৩৬	৪৭.০
	১৯৩৭	২৯.০

বিভিন্ন জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগে পরীক্ষিত সরিষার তেলের
শতকরা ভেজাল-সংখ্যা

খুলনা	১৯৩৫	২২.২	রাজসাহী	৩৩.৭	পাবনা	৪২.০
	১৯৩৬	১১.৫		৩৯.৫		৪৫.১
	১৯৩৭	৬.৭		২৮.৯		৩৭.৮
	১৯৩৮	৯.৩		৩৪.৪		৪৯.০

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে খাদ্য-আইন জারি, ধরপাকড়, জরিমানা করেও ব্যবসায়ীদের ভেজালের বেসাতি থেকে বিশেষ বিরত করা যায় নি।

ঘি ও তেলকে সাধারণত বীজাণুনাশক বলে। তাই সরিষার তেলে বা ঘিয়ে সংক্রামক ব্যাধিঘটিত বীজাণুর অবস্থিতি পরীক্ষা করা হয় না। মধ্যে এপিডেমিক ড্রপসি (epidemic dropsy) রোগের কারণ নির্ণয় করতে চিকিৎসকদের সরিষার তেলের উপর দৃষ্টি পড়ে। বর্ষব্যাপী পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে সরিষার তেলে মিশ্রিত শিয়ালকাঁটার বীজের তেল উক্ত ব্যাধির অন্যতম কারণ। শিয়ালকাঁটার বীজ-নিষ্কাশিত তেল যে বিক্রেতারা ইচ্ছা করে মেশায়, তা নয়। সরিষার ক্ষেতে আগাছা রূপে শিয়ালকাঁটা জন্মে থাকে, তার বীজ ক্ষেত্রজাত সরিষার দানা সংগ্রহের সময় মিশে যায়। ফলে সরিষার দানার তেলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিয়ালকাঁটার বীজের তেলও সংমিশ্রিত হয়।

অন্যান্য ব্যবহার্য তেল

বাদাম তেল ॥ বাদামের শাঁস থেকে তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে অল্প পরিমাণে হলেও বিভিন্ন দেশে বাদাম-তেলের বহুল প্রচলন আছে। ক্যানারি দ্বীপে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, ফ্রান্স, মরক্কো, পারস্যদেশ, পর্তুগাল, স্পেন, সিসিলি ও সিরিয়ায় প্রচুর পরিমাণে বাদাম জন্মায়। শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ তেল বাদামের শাঁস থেকে পাওয়া যায়। বিবিধ প্রলেপ বা ঔষধের দ্রাবক হিসাবে এ তেল ব্যবহার করা হয়। এ তেলে ভেজাল হিসাবে খোবানির তেল ব্যবহার করা হয়। অবশ্য রাসায়নিক পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে।

রেড়ির তেল ॥ রেড়ির তেল শুধু আমাদের দেশে কেন, যে কোনো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। রেড়ির বীজে শতকরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ ভাগ তেল আছে। বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে রেড়ির বীজ ভারতবর্ষই রপ্তানি করে। আর কতকটা পাওয়া যায় চীনদেশ, মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে। বিমানপোতের কলকব্জায় তেল দেবার জন্য এ তেল আজকাল বড় বেশি ব্যবহার হচ্ছে, তাই এর চাহিদাও বেড়ে গেছে। অবশ্য বিশুদ্ধ রেড়ির তেলের ঔষধেও ব্যবহার আছে। শোনা যায় মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখতে ও চুলের গোড়া শক্ত করতে এ তেল সাহায্য করে। দুই শ্রেণীর তেল বাজারে চলে। প্রথমশ্রেণীর তেল একেবারে কাঁচের মত স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন হয় ও অম্লতা কম থাকে। আর তৃতীয়শ্রেণীর তেলের রং হলদে বা ব্রাউন হয় এবং তার অম্লতাও খানিকটা বেশি থাকে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়শ্রেণীর কথা ব্যবসায়ীরা উল্লেখ করে না। ১ মণ বীজ থেকে প্রায় ১৫ সের প্রথমশ্রেণীর তেল আর ৪ সের তৃতীয়-শ্রেণীর তেল নিষ্কাশিত করা যায়। ঔষধের জন্য ব্যবহৃত তেলের গন্ধ নাশ করবার জন্যে নিষ্কাশনের পর তেলটিকে বিশেষভাবে উত্তপ্ত বাষ্পদ্বারা শোধন করা হয়।

খাঁটি রেড়ির তেল অন্যান্য তেল থেকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। সাধারণ তেলের চাইতে রেড়ির তেল অনেকটা বেশি ঘন ; এর অ্যাসেটাইল মূল্যও অনেক বেশি। রেড়ির তেলের পরীক্ষা করতে হলে তেলের

নমুনাটিকে পেট্রলে দ্রবিত করতে হয় এবং খুব জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে তারপর স্থির করে রাখতে হয়। অনেকক্ষণ পরে তেল ও পেট্রলের দুইটি স্তর বিভক্ত হয়ে যায়। নীচেকার স্তরে রেড়ির তেল খানিকটা পেট্রলে দ্রবিত হয়ে থাকে। যদি পূর্বে ২০ কিউবিক সেন্টিমিটার তেল নিয়ে পরীক্ষা সুরু করে থাকি এখন ১২ কিউবিক সেন্টিমিটার তেল নীচেকার স্তর থেকে পাই। আর উপরের স্তরের পেট্রল যদি পরীক্ষার আগে ৮০ কিউবিক সেন্টিমিটার থাকে ত এখন তার চেয়ে কম হয়ে যায়। উপরের স্তরের ৫০ কিউবিক সেন্টিমিটার যদি সাবধানে মেপে নিই ও পেট্রল-বাষ্পায়িত করে দিই, তাহলে স্বল্প পরিমাণ রেড়ির তেল পড়ে থাকে; কতটুকু পড়ে থাকে তা সাবধানে ওজন করে নেওয়া হয় এবং সংখ্যাটিকে ৫ দিয়ে গুণ করা হয়, এই গুণিত সংখ্যাটিকে ফ্রাবো-সংখ্যা (Frabot number) বলে। বিশুদ্ধ রেড়ির তেলের ফ্রাবো-সংখ্যা হলো ৭·৮। রেড়ির তেলে রজন-তেল ভেজাল দেওয়া হয়। যে কোনো তেল ভেজাল থাকলে রেড়ির তেলের অ্যাসেটাইল মূল্য কমে যায়। তাই ভেজাল ধরা শক্ত নয়। রেড়ির তেলের দুইটি ব্যবহারের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সালফিউরিক অ্যাসিড ঘটিত করে সালফোনেটেড রেড়ির তেল তৈরি হয়। এলিজারিনের সঙ্গে মিশ্রিত করলে সালফোনেটেড রেড়ির তেলে ঘন লাল রং উৎপন্ন হয়, তাই 'টার্কি রেড অয়েল' নামে এ তেল রঞ্জনশিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। শুধু তাই নয়, রেশম ও চামড়া মসৃণ করতে, স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত করতে, কৃত্রিম চামড়া, টাইপরাইটারের কালি প্রস্তুত করতেও এ তেলের ব্যবহার আছে।

চালমুগরার তেল॥ চর্মরোগ, কুষ্ঠ ও ক্ষতরোগের জন্য চালমুগরার তেল স্মরণাতীত কাল থেকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্যবহার হয়ে আসছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলেও এ তেলের প্রচলন আছে। আসল চালমুগরার বীজ (লাতিনে গাছের নাম Taraktogenos Kurzii) ব্রহ্মদেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে ও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। শ্যাম ও পূর্ব-ভারতে যে জাতীয় বীজ পাওয়া যায় তার নাম Hydnocarpus, আফ্রিকায় পাওয়া যায় Oncoba এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় Carpotroche, Lindackeria ও Mayna জাতীয় গাছের বীজ

পাওয় যায়। মোট কথা, প্রত্যেকটি জাতীয় বীজ থেকে কুষ্ঠরোগে ফলপ্রদ তথাকথিত চালমুগরার তেল পাওয়া যায়।

শোনা যায়, ব্রহ্মদেশ ও আসাম থেকে চীনারা চালমুগরার বীজ নিয়ে যেত এবং নিজেদের ব্যবহারের জন্যে তেল পিষে নিত। পরে তারা জানতে পারে যে শ্যাম ও ভারতবর্ষে জাত এই তেল বিশেষের বীজ (Hydnocarpus) থেকে উৎকৃষ্ট তেল পাওয়া যায়। আজকাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে দক্ষিণ-আমেরিকা জাত Carpotroche brasiliensis এর বীজ-তেলই 'চালমুগরা তেল' হিসাবে কুষ্ঠরোগে ব্যবহারে সর্বোৎকৃষ্ট। দক্ষিণ-আমেরিকায়, ফিলিপাইন, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন জাতের চালমুগরার চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশে প্রত্যেক বছরে চালমুগরার ফল ধরে না। তাই চালমুগরা-বীজ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে দুই-তিন বছর অন্তর লোক পাঠান হয়। চালমুগরা-ফলের বীচি অনেকটা ছোট ছোট নুড়ির মত দেখতে। শতকরা প্রায় পঞ্চান্ন ভাগ তেল বীজ থেকে পাওয়া যায়। এক ফোঁটা চালমুগরা তেলে সামান্য ক্লোরোফরম ও অ্যাসেটিক অ্যাসিড ঢালার পর চার-পাঁচ ফোঁটা সলফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করলে ধীরে ধীরে ঘন সবুজ রং উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া দিয়ে চালমুগরা তেলের উপস্থিতি প্রমাণ করা যায়।

ত্রিবাঙ্কুরে একজাতীয় Hydnocarpus জন্মায়, যার বীজে শতকরা ষাট ভাগ চালমুগরার তেল পাওয়া যায়। এর্নাকুলম থেকে এই তেল ও বীজ বিদেশে রপ্তানি হয়। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্যে এই তেল শুধু এদেশে নয়, নানা দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শিমুল বীজের তেল॥ শিমুল গাছ ভারতবর্ষ ও সিংহলের বিভিন্ন জায়গায় জন্মায়। শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ তেল পাওয়া যায়। প্রদীপে জ্বালাবার জন্য আমাদের দেশে এই তেল ব্যবহার করা হয়। যবদ্বীপে এ তেল খায় এবং সাবানশিল্পে ব্যবহার করে।

ম্যাকাসার বা কুসুমতেল॥ ভারতবর্ষে ও সিংহলে প্রচুর পরিমাণে কুসুমগাছ জন্মায়। শতকরা প্রায় সত্তর থেকে বাহাত্তর ভাগ তেল এর বীজ থেকে পাওয়া যায়। কেশ-পতন নিবারণে ম্যাকাসার তেলের সুখ্যাতি আছে। কেশ-তৈল হিসাবে বাজারে বেশ চড়া দামে বিক্রয় হয়।

জলপাইয়ের তেল॥ এদেশে জলপাইয়ের তেলের খুব বেশি চলন

না হলেও ইউরোপে ও অন্যান্য মহাদেশে এর ব্যবহার খুব বেশি পরিমাণে হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ইউরোপে জলপাইয়ের তেল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। ভূমধ্য সাগরের তটবর্তী দেশে, অস্ট্রেলিয়ায়, ক্যালিফোর্নিয়ায়, দক্ষিণ-আফ্রিকায়, মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকায় জলপাইয়ের চাষ হয়ে থাকে। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ তেল জলপাইয়ের ফল থেকে পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীতে বছরে প্রায় তিন হাজার মণ জলপাইয়ের তেল উৎপন্ন হয়। স্পেন, ফ্রাস ও ইতালীতে উৎপন্ন তেল সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করা হয়। স্পেনেই সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে জলপাইয়ের তেল উৎপন্ন হয়। বিঘাপ্রতি জমিতে ৫ মণ করে জলপাই ফলে। অবশ্য ইতালি সহস্রাধিক বছর ধরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে তেল উৎপন্ন করত। কিন্তু এ বিষয়ে স্পেনের অভ্যুত্থান হওয়ার পর পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ইতালি বছরে প্রায় ৬ লক্ষ মণ জলপাইয়ের তেল উৎপাদন করে। ইতালির পরে এ বিষয়ে গ্রীসের স্থান। তারপর আসে পর্তুগাল, টিউনিস, অ্যালজেরিয়া, তুর্কী ও ফ্রান্স।

স্যালাড (salad) তৈরি ও রাঁধবার জন্য জলপাইয়ের তেল খুব ব্যবহার হয়। সার্ডিন ইত্যাদি মাছ টিনে ভরবার জন্যে তৈলাক্ত করতে এ তেল ব্যবহার হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যে জোলাপ হিসাবেও জলপাইয়ের তেলের প্রচলন আছে। সাধারণত তুলার বীজের তেল, চিনাবাদাম তেল, সরিষা, তিল, সয়াবীন, সূর্যমুখীর তেল, এমনকি চায়ের বীজের তেল পর্যন্ত জলপাই তেলে ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ইতালির তেল এদেশে আসা বন্ধ হল তখন বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা এত বেশি পরিমাণেই চিনাবাদামের তেল জলপাই-তেলে মিশিয়েছিলেন যে জলপাইয়ের তেল বলে তাকে আর চেনা যেত না।

নারিকেল তেল ॥ নারিকেলের শাঁস থেকে নিষ্কাশিত তেলের সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয় আছে। সমুদ্রতটবর্তী গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বহুল পরিমাণে নারিকেল জন্মে থাকে। সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে নারিকেল বৃক্ষের অরণ্য আছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ভালো করে চাষ করলে বছরে এক বিঘা জমি থেকে দুই হাজার নারিকেল অনায়াসে পাওয়া যায়। মলয় দ্বীপে এক

জাতীয় খাটো নারিকেল গাছ আছে যার ডাবের রং ফিকা হলদে। এই জাতের নারিকেল প্রচুর ফলে, বিঘা প্রতি জমিতে প্রায় তিন হাজার ফলে। এর শাঁসের ওজনও প্রায় দশ মণ। অথচ সাধারণ গাছের এক বিঘায় উৎপন্ন নারিকেলের শাঁসের ওজন মাত্র সাড়ে চার মণ। সিংহলে ২৪,০০,০০০ বিঘা জমিতে নারিকেল চাষ হয়; বলতে গেলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়। তারপর হয় দক্ষিণ-আমেরিকায়, ১৫,০০,০০০ বিঘা জমিতে। টাটকা নারিকেল শাসেতে শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ তেল থাকে। রৌদ্রশুষ্ক শাঁসেতে প্রায় পয়ষট্টি ভাগ তেল থাকে। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে স্মরণাতীত কাল থেকে নারিকেল তেল নিষ্কাশিত হয়ে আসছে। মালাবার উপকূলে 'কোচিন-তেল' বলে যা বিদেশে রপ্তানি হয়, তা উৎকৃষ্ট নারিকেল তেল ছাড়া আর কিছু নয়। শুষ্ক নারিকেল শাঁসও বহুল পরিমাণে আমেরিকায় রপ্তানি হয়। শোধিত নারিকেল-তেল হাইড্রোজেনায়িত করে কৃত্রিম ঘি বা মার্জারিনে রূপায়িত করা হয়। সাবানশিল্পেও নারিকেল-তেল ব্যবহার হয়। খাদ্যহিসাবে নারিকেল তেল ভাল। আমাদের দেশেও মাথায় মাখবার জন্য সুবাসিত নারিকেল-তেল আমরা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের দেশে নারিকেল-তেলে খনিজ তেল ভেজাল দেবার রীতি আছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নানা জাতের পাম (palm) বা তাল জাতীয় গাছ জন্মায়। সুপারি নারিকেল সাগুদানা খেজুর তাল ইত্যাদি সবগুলিকেই পাম শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চলে এক জাতীয় পাম গাছের ফলের শাঁস থেকে তেল তৈরী করা হয়। এখন সুমাত্রা দ্বীপে এই পামের চাষ হয়, এবং কম নয়, ত্রিশ লক্ষ বিঘা জমিতে চাষ করা হয়। বেশির ভাগ সাবানশিল্পে এই তেল ব্যবহার করা হয়। টিনপ্লেটিং-শিল্পেও এর ব্যবহার আছে। লোহার পাতের উপরিভাগ ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলে পাম-তেল লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে বাতাসের স্পর্শে বা জলের স্পর্শে মরিচা না ধরে যায়। পরে গলিত টিন তাতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বেলজিয়ান কঙ্গোতে ডিজেল (Diesel) জাতীয় এঞ্জিনে পাম-তেল ব্যবহার করছে। অবশ্য সর্বোৎকৃষ্ট তেল থেকে মার্জারিন তৈরী হয়। রসায়নশাস্ত্র অনুসারে এই

পাম-তেলের সঙ্গে নারিকেল তেলের বিশেষ কোনো বড় পার্থক্য নেই।

চিনাবাদাম তেল॥ পাঁচ-ছয় জাতের চিনাবাদাম থেকে তেল পেষাই করা হয়। আমাদের দেশে যে জাতের চিনাবাদামের চাষ করা হয়, তার আদিম বাসস্থান হ'ল ব্রাজিলে, দক্ষিণ-আমেরিকায়। ব্রাজিল থেকে চিনাবাদামের প্রচলন হয় আফ্রিকায়, আবার আফ্রিকা ঘুরে ভার্জিনিয়া সহরে এসে পৌঁছায়। আমাদের দেশে অবশ্য সেকালে চীনদেশ থেকে এই বাদাম আসে। এখন ভারতবর্ষ চিনাবাদাম সরবরাহে পৃথিবীর অন্যতম দেশ বলে পরিগণিত। মাদ্রাজ বোম্বাই ও ব্রহ্মদেশে চিনাবাদামের চাষ হয়। ওদিকে চীন জাপান যুক্তরাষ্ট্র স্পেন আর্জেনটিনা নাইজেরিয়া ফরাসি-সুদান ও গাম্বিয়াতেও চাষ হয়। স্পেনে চাষ করা চিনাবাদাম থেকে সবচেয়ে বেশি এবং ভালো জাতের তেল পাওয়া যায়। চিনাবাদাম-তেল হাইড্রোজেন-ঘটিত করে মার্জারিন তৈরী করা হয়। এমনিও স্যালাড-তেল হিসাবে ও রাঁধার জন্য ব্যবহার হয়। সাবানশিল্পেও অন্যান্য তেলের মত ব্যবহার করা হয়। আমরা বাঙালিরা চিনাবাদাম-তেল রাঁধার জন্য ব্যবহার করতে চাই না বটে, কিন্তু খাদ্যগুণ ধরে এ তেল ব্যবহার করা ভালো। তিল-তেল, নারিকেল-তেলও রাঁধার জন্য ব্যবহার করা সত্যিই ভাল। আস্বাদ ভালো লাগে না মনে করে আমরা ব্যবহারে বিরত হই বটে, তবে কিছু দিন ব্যবহার করলে আর খারাপ লাগে না।

যে তেল চিনাবাদাম-তেলের চাইতে সস্তা, সে তেল সাধারণত ভেজাল রূপে ব্যবহার হয়। তুলার বীজের তেল, তিলের তেল, পপির বীজের তেল ভেজাল হিসাবে ব্যবহার হয়।

ভুট্টার তেল॥ ভুট্টার বীজ থেকে যে তেল তৈরি হয় এবং শিল্পে ব্যবহার হয় তা অনেকেই জানে না। রং-শিল্পে তিসির তেলের যতটা ব্যবহার ভুট্টার তেলের ব্যবহার ততটা নয়। তবে অয়েলক্লথ ও লিনোলিয়ম নামে ম্যাটিং তৈরি করতে এই তেল খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয়ে থাকে। আমোরিকায় খুব বেশি পরিমাণে এ তেল তৈরি হয়। স্যালাডে খাবার জন্য এবং রাঁধবার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই মনে হয়, কেবল সরিষার তেল ছাড়া অন্য তেল যে আর ব্যবহার করা চলে না আমাদের

দেশের জনসাধারণের এ ধারণা খুব ভুল। এক তিসির তেলই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। অন্যান্য বীজ তেল বিভিন্ন দেশে খাদ্যহিসাবে অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তুলার বীজের তেল॥ কাপাস তুলার বীজ থেকে তেল নিষ্কাশিত করা হয়, এবং বহুল পরিমাণে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বেশির ভাগই কৃত্রিম ঘি বা মার্জারিন করতে কাজে লাগে। স্যালাড ও রন্ধন-কার্যেও লাগান হয়। এবং সর্বশেষে তেল তেমন বিশুদ্ধ না হলে সাবান-শিল্পে চালান করা হয়। আমাদের দেশে এর তত বেশি প্রচলন নেই, আমেরিকায় খুব চলে।

ক্রোটোন তেল॥ অব্যর্থ জোলাপ হিসাবে ব্যবহার হয়। চীন ও দক্ষিণ-এশিয়ায় ক্রোটোন গাছ জন্মায়। জনসাধারণ ক্রোটোন তেলের সঙ্গে বড় বেশি পরিচিত নন কিন্তু এটি চিকিৎসকদের সুপরিচিত। এ জোলাপ এত গুরু যে, জিহ্বার তালুতে দুই ফোঁটা দিলেই সুফল পাওয়া যায়।

তিল তেল॥ ভারতবর্ষে তিল-তেলের ব্যবহার তেল হিসাবে প্রাচীন-তম বললে অত্যুক্তি হবে। এর কথা অথর্ববেদে পাওয়া যায় বলে প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হ'য়েছে। চীন আফ্রিকা ভারতবর্ষ জাপান যবদ্বীপ শ্যামদেশ মিশর মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে তিলের চাষ আজও করা হয়। বোধকরি চীনদেশেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে চাষ হয়। আমরা বাঙালিরা তিল-তেল খেতে পছন্দ করি না, কেবল কেশতৈলরূপে ব্যবহার করি। অথচ চীনদেশে সর্বোৎকৃষ্ট রন্ধনতেল বলে পরিগণিত হয় এবং বহু মূল্যে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে অন্যান্য প্রদেশে রাঁধবার জন্যে তিল-তেল ব্যবহার করে এবং আমরা শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করে থাকি।

তিসির তেল॥ তিসির তেল আমাদের সুপরিচিত। রং দ্রবিত করতে এ তেল আমরা ব্যবহার করে থাকি। আর্জেনটিনা ক্যানাডা মরক্কো ভারতবর্ষ রাশিয়া ও আমেরিকায় তিসির চাষ হয়ে থাকে। শতকরা চল্লিশ ভাগ তেল বীজ থেকে পাওয়া যায়। রং, বার্নিশ, ছাপাখানার কালি, ওয়াটারপ্রুফ, অয়েল ক্লথ, লিনোলিয়ম প্রভৃতি শিল্পের তিসির তেল একমাত্র তেল বলা চলে। সত্যকথা বলতে 'লিনোলিয়ম' নামটি ম্যাটিংকে দেওয়া হয়েছিল লিনসিড বা তিসির তেল থেকে তৈরী হয় বলে। তিসির লাতিন

নাম লাইনাম, আর তেলের নাম ওলিয়ম ; তাই রাসায়নিক সন্ধি করে ওলিয়ম বা লাইনোলিয়ম বা লিনোলিয়ম নামকরণ করা হয়েছে।

পোস্তর তেল ॥ পপি-বীজ বা পোস্তর তেল আমাদের দেশে তেমন চলে না। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানিতে খুব বেশি ব্যবহার হয়, রাঁধবার জন্যেই ব্যবহার হয়। তৈলচিত্রকরেরা রং গুলতে পোস্তর তেল ব্যবহার করেন কারণ এ তেল সহজে শুকিয়ে যায়।

সয়াবীনের তেল ॥ তিসির তেলের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট বলে সয়াবীনের তেল রং-শিল্পে, অয়েলক্লথ-শিল্পে, ছাপাখানার কালি তৈরি করতে ব্যবহার হচ্ছে। এর একটা সুবিধা হচ্ছে এ তেলে গোলা রং অনেক দিন পরে তিসির তেলে দ্রবিত সাদা রংয়ের মত হলদে ছোপ ধরে যায় না। আমাদের দেশেও সয়াবীন জন্মায়। চীন কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ও ইউরোপ সব দেশেই জন্মায়। চীনদেশেই সব চেয়ে বেশি পরিমাণে সয়াবীনের চাষ হয়।

টুং-তেল ॥ অনুস্বারযুক্ত নাম শুনে আশা করি আন্দাজ করেছেন এ তেলের জন্মস্থান চীনদেশে। বাজারে টুং বা চিনাকাষ্ঠের তেল বলে পরিচিত। যদিও কাঠ থেকে এ তেল নিষ্কাশিত হয় না, হয় অন্যান্য তেলের মত বীজ থেকেই। টুং-গাছ খুব বড় বড় হয়, ত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বীজগুলি অনেকটা বাদামের আকৃতি, বড় বড়। চীনারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই টুং-তেল কাঠের পচননিবারক হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। এ তেল লাগিয়ে দিলে কাঠের ভিতরে আর জল প্রবেশ করতে পারে না। রং ও বার্নিশ-শিল্পে তিসির তেলের মত চীনারা টুং-তেল ব্যবহার করে। গালার বার্নিশ হিসাবেও ব্যবহার করে। কাগজ যাতে জলে না ভেজে তার জন্যেও ব্যবহার করে। এঞ্জিনিয়ারদের নকসা আঁকার ঘন কালো যে কালি চিনা-কালি বলে প্রসিদ্ধ তা এই তেল জ্বালিয়ে ভূষো পুড়িয়ে করা হয়।

মাছের তেল ॥ জান্তব তেল বা স্নেহ সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ তেলও কতকগুলি বিভিন্ন অ্যাসিডের গ্লিসারাইড। তা ছাড়াও কতকটা অংশ থাকে যা কস্টিক পটাশের উপস্থিতিতে সাবানভূত হয় না। তেলের সাবানভবনী-গুণের কথা পূর্বেই বলা হ'য়েছে। কস্টিক পটাশ জাতীয় ক্ষার তেলের গ্লিসারাইড অংশটি থেকে গ্লিসারিন

বিযুক্ত করে দিতে পারে। যে অংশটুকু থেকে গ্লিসারিন বিযুক্ত হতে পারে তাকে বলা যেতে পারে সাবান-সম্ভব-বস্তু। এ ছাড়াও খানিকটা অংশ থাকে যা থেকে গ্লিসারিন বিযুক্ত হয় না, অর্থাৎ সাবান-সম্ভব হয় না। এই অংশে ভিটামিন জাতীয় স্বাস্থ্যগঠনের অত্যন্ত আবশ্যকীয় পদার্থ বর্তমান থাকে। কতকগুলি বিদেশী মাছের তেলে ভিটামিন এ বর্তমান আছে বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন ধরুন কড, স্যামন, সার্ক বা হাঙার ও ইল্। ইল্ মাছের অনুরূপ হ'ল আমাদের দেশের বান মাছ, যা অনেক বাঙালিই খান না। অথচ ইল্ মাছে ভিটামিন এ বর্তমান আছে পরীক্ষিত হয়েছে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে যে উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কই মাগুর মাছ স্বাদু হিসাবে বিখ্যাত কিন্তু ভিটামিনবর্জিত। ইলিশ মাছে যথেষ্ট তেল পাওয়া যায়, কিন্তু সে তেলে ভিটামিন নেই বললেই চলে। রুই মাছে তবু আছে, মৃগেল ও কাতলে নেই। অবশ্য যে কোনো মাছেই প্রোটিনজাতীয় পদার্থ থাকায় স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার অবশ্য করা উচিত। কিন্তু বিদেশীয় কড মাছের মত যদি কেবল ভিটামিনের জন্য খেতে হয় তাহলে টাইজাতীয় সামুদ্রিক মাছ, অভাবে রুইমাছ, বিশেষ করে রুই মাছের তেল খাওয়া কর্তব্য। ইউরোপে জান্তব তেল হাইড্রোজেনায়িত করে মার্জারিন তৈরি করার প্রচলন আছে। এ দেশে এখনও প্রচলিত হয় নি।

পরিশিষ্ট

ক. তেলের বিভিন্ন ব্যবহার

(১) খাদ্য হিসাবে

তেলের নাম	ব্যবহারের স্থান
সরিষার তেল	ভারতবর্ষ
জলপাইয়ের তেল	ইউরোপ
নারিকেল তেল	দক্ষিণ-ভারত
চিনাবাদাম তেল	ব্রহ্মদেশ, চীন ভারতবর্ষ
তুলার বীজের তেল	আমেরিকা
তিল তেল	ভারতবর্ষ চীন ব্রহ্মদেশ
ভুট্টার তেল	আমেরিকা
পোস্তর তেল	জার্মানি ও ফ্রান্স

(২) হাইড্রোজেনায়িত করে কৃত্রিম ঘি প্রস্তুতিতে

নারিকেল ও অন্যান্য 'পাম' (Palm) তেল
চিনাবাদাম তেল
তুলার বীজের তেল

(৩) রং বা রঞ্জনশিল্পে

তিসির তেল
পোস্তর তেল
সয়াবীনের তেল
টুং তেল

(৪) কেশবিলাসে

রেড়ির তেল
নারিকেল তেল
ম্যাকাসার তেল
তিল তেল

(৫) ঔষধে

ক্রোটোন তেল
চালমুগরার তেল
রেড়ির তেল
বাদাম তেল

(৬) প্রদীপ জ্বালাতে

রেড়ির তেল
সরিষার তেল
শিমুলবীজের তেল

খ. তেলের রাসায়নিক পরিমাপ-মূল্যের বৈশিষ্ট্য

তেলের নাম	আপেক্ষিক গুরুত্ব	প্রতিসরাঙ্ক	সাবানভবনী গুণ	আইডিন-শোষণ গুণ
বাদাম তেল	০.৯১৯০(১৫°)	১.৪৭০৫(২০°)	১৮৩-১৯৬	৯৫-১০২
রেড়ির তেল	০.৯৫৮০	১.৪৭৭০(২৫)	১৭৭-১৮৭	৮২-৯০
চালমুগরার তেল	০.৯৪৫০(৩০°)	১.৪৭৭০(২৫°)	১৯৮-২০৮	৯৮-১০৫
শিমূল বীজের তেল	০.৯২০৮(১৫°)	১.৪৬১০(৪০°)	১৯৩-১৯৪	৭৪-৭৮
ম্যাকাসার তেল		১.৪৫৯৭(৪০°)	২২৭	৫৪.৫
জলপাইয়ের তেল	০.৯১৪৫(১৫°)	১.৪৬০৬(৪০°)	১৮৫-২০০	৭৭-৯৪
নারিকেল তেল	০.৯২৬০(১৫°)	১.৪৪৯৫(৪০°)	২৫১-২৬৩	৮-৯.৬
চিনাবাদাম তেল	০.৯১২৮(২৫°)	১.৪৬৪০(২০°)	১৮৬-১৮৭	৯৩-৯৫
ভূট্টার তেল	.৯১৯৭(২০°)	১.৪৭৪৬(২০°)	১৯০	১২৬
তূলার বীজের তেল	.৯১৬০(১৫.৫)	১.৪৭২০(২০°)	১৯২-২০০	১০০-১১৫
ক্রোটোন তেল	.৯৩৭০(১৫°)	১.৪৭০০(৪০°)	২০০-২১৫	১০২-১০৮
সরিষার তেল	.৯১৫২(১০°)	১.৪৭২০(২০°)	১৬৯-১৭৫	৯৬-১০৪
তিল তেল	.৯১৩৯(১৫.৫)	১.৪৭২০(১৫°)	১৭০-১৮০	৯৮-১০৬
তিসির তেল	.৯২৭০(২০°)	১.৪৭৮৬(২৫°)	১৮৯-১৯৬	১৭০-২০৪
পোস্তর তেল	.৯২৪০(১৫°)	১.৪৭৫১(২০°)	১৮৯-১৯৬	১৩২-১৪০
সয়াবীনের তেল	.৯২০৩(২৫°)	১.৪৭৩৬(২০°)	১৮৯.৫	১২৮
টুং তেল	.৯৩৯০(১৫.৫)	১.৫২০৬(১০°)	১৮৯-১৯৫	১৫৭-১৭০

গ. তেলের বীজের ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম

বাংলা	ইংরেজি	লাতিন বা উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
বাদাম	Almond	*Prunus amygdalus*
রেড়ি	Castor	*Ricinus communis*
শিমুল	Kapok	*Bombax malabaricum* (ভারতবর্ষ) *Eriodendron anfractuosum*(যবদ্বীপ)
কুসুম	Macassar	*Schleichera trijuga*
জলপাই	Olive	*Olea europaea*
নারিকেল	Cocoanut	*Cocos nucifera*
চিনাবাদাম	Peanut	*Arachis hypogaea*
ভূট্টা	Corn	*Zea mays*
কাপাস	Cotton	বিভিন্ন জাতের *Gossypium*
ক্রোটোন	Croton	*Croton tiglium*
সরিষা	Mustard	বিভিন্ন জাতের *Brassica* ও *Sinapis*
তিল	Sesame	*Sesamum indicum*
তিসি বা মসিনা	Linseed or Flax	*Linum usitatissimum*
পোস্ত	Poppy	*Papaver somniferum*
সয়াবীন	Soyabean	*Glycine max*
টুং	Tung	বিভিন্ন জাতের *Aleurites*
শোরগোঁজা	Niger	*Guizota abyssinica*
চালমুগরা	Chaulmoogra	বিভিন্ন জাতের *Taraktogenos* (ব্রহ্মদেশ), *Hydnocarpus* (ভারতবর্ষ), *Oncoba* (আফ্রিকা), *Carpotroche* *Lindackeria* ও *Mayna* (আমেরিকা)

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ